গদ্যাচারণ ২

ভাষার ভাষা

অর্ণব

arnabik9@yahoo.co.uk

ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের সহবাস তাঁরা জনসনীজ নামক ভাষারীতির সাথে সম্যক পরিচিত। ব্যাপারটা সহজভাবে এই - লাতিন ভাষা একসময় ইংল্যান্ডের পন্ডিতমন্যতার অভিজ্ঞান ছিল। আমাদের দেশে যেরকম সংস্কৃত বা ফারসি জ্ঞানকে জ্ঞানীর লক্ষণ মনে করা হত, ইংল্যান্ডেও লাতিন জ্ঞান ছিল জ্ঞানবানের জ্ঞানপ্রদর্শনীর প্রধান পসরা। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত পন্ডিত ও সাহিত্যজ্ঞ ড. স্যামুয়েল জনসন আমদানি করেন লাতিনায়িত ইংরেজি ভাষাকে। এই বিশিষ্ট ভাষারীতিই তাঁর নামানুসারে পরিচিত হয় জনসনীজ নামে। জনসনীজের সংজ্ঞা দানের বদলে একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া যাক - সেটি পাঠকের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক হবে।

> " The Proverbial oracles of our parsimonious ancestors have informed us, that the fatal waste of our fortune is by small expenses, by the profusion of sums too little singly to alarm our caution, and which we never suffer ourselves to consider togather. Of the same kind is the prodigality of life; ha that hopes to look back hereafter with satisfaction upon past years, must learn to know the present value of single minutes and endeavour to let no particle of the time fall useless to tha ground."

ড. স্যামুয়েল জনসনের এই দন্ত-বিদারক ভাষারীতির সহজবোধ্য অর্থ ঃ

> 'Take care of pennies' says the thrifty old proverb, 'and the pound will take care of themselves'. In the like manner we might say, 'take care of the minutes and the years will take care of themselves'.

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ামের একদল সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতের হাতে। যাঁরা বাংলা সাহিত্যের রচনায় সংস্কৃত ভাষারীতিকে আদর্শ করে এগোতেন। ফলে শুরুতেই বাংলা সাহিত্য একপ্রকার জনসনীজের পাল্লায় পড়ে। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, এইসব সংস্কৃতজ্ঞগণ হয়ত প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিক দন্ডী'র বচনকে আদর্শ করেছিলেন ঃ গদ্য কবীনাং নিকষং বদন্তি। অর্থাৎ, গদ্য লেখকের প্রতিভা যাচাই করার কষ্টিপাথর। তাই স্যামুয়েল জনসন থেকে রামরাম বসু সবাই প্রতিভা প্রতিফলনের নেশায় ভাষাটির চরম দুর্দশা ডেকে আনেন।

প্রথমেই বাংলা জনসনীজের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

> ''অনন্তর এক দিবস কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী রাত্রিতে রাজা করুণার সহিত রোদন শব্দ শুনিলেন। শূদ্রক কহিলেন কে কে এই দ্বারে। সে কহিল, হে মহারাজ, আমি বীরবর। রাজা বলিলেন, ক্রন্দনের অনুসরণ কর। বীরবর কহিলেন, হে মহারাজ, যে প্রকার আজ্ঞা করেন। ইহা কহিয়ে চলিল।
>
> (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, হিতোপদেশ, ১৮০৮)

রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষাকে এই সংস্কৃতায়নের রৌরব থেকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের সামনে বাংলা গদ্যের বিশেষ আদর্শ ছিল না। রাজা ছিলেন মূলত চিন্তক ও সমাজ সংস্কারক। কথাসাহিত্যিক সুলভ কল্পনাশক্তির অভাব ছিল তাঁর মধ্যে। উপনিষদ বা চিন্তাগ্রন্থের ভাবগাম্ভীর্যের মাঝেও তবু আমরা তাঁর গদ্যের সজীবতার কিছু নমুনা দেখি ঃ

> ''প্রথমত বুদ্ধির বিষয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয় আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন''

এই ভাষা সরল বটে বিরামচিহ্নের অনুপস্থিতির কারণে অত্যন্ত অদ্ভুদ। বিরামচিহ্ন তখন বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে।

রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না। ভাষাকে তিনি সম্ভবত মত প্রকাশের মাধ্যম হিসাবেই দেখতেন - শিল্পমাধ্যম হিসাবে নয়। উপরোন্ত তিনি নিজেও ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। তাই বাংলা গদ্যের প্রমিত রূপ কি হবে তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। অনেক রচনাতেই সরল বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃতায়িত বাংলাতেও তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ঃ

> '' যে সর্ব্বব্যাপী ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ আমাদের জীবাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় সত্যাখ্য সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করিয়া চিদ্রূপ পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে একত্ব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবেক।''
>
> (গায়ত্রীর অর্থ, ১৮১৮)

তাঁর রচনাবলি প্রাচীন বাংলা থেকে আধুনিক বাংলায় অনূদিত হবার দাবি রাখে।

বাংলা গদ্যের প্রমিত রীতি নিয়ে প্রথম চিন্তা করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁর সাহিত্যচিন্তা রাজার মত মূলত সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাষাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষার মাধ্যম নিয়েও তাঁকে যথেষ্ট ভাবতে হয়। এই দুই শিক্ষার মাধ্যম হ'ল সাহিত্য। সাহিত্য বলতে আজ যা বোঝান হয়, সেই সাহিত্য তাঁর হাত থেকে বের হয়নি। তিনি লিখে যান কিছু পাঠ্যপুস্তক। বঙ্কিম সেকারণে তাঁর প্রতিভাকে কিছুটা কাটো করতে চাইলেও পরে একথাও স্বীকার করেছেন যে সাহিত্যপ্রতিভা ও কল্পনাশক্তিতে তিনিও কিছু কম ছিলেন না।

আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গদ্যরচনার চারটি বিশেষ ধারা তুলে ধরেছেন।

প্রথমত সহজ সাধুভাষা ঃ

> '' লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত জলধর মন্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমনীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।''
>
> (সীতার বনবাস, ১৮৬০)

দ্বিতীয়ত সংস্কৃতপ্রধান গম্ভীর রচনা ঃ

‘‘ একে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি, সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা ; তাহাতে আবার ঘনঘটা দ্বারা বায়ুমন্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল ; আর ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না।’’

(বেতাল পঞ্চবিংশতি, ১৮৪৭)

আচার্যদেব কি সূত্রে এই দুই রচনাংশকে ‘সহজ সাধুভাষা’ ও ‘সংস্কৃতপ্রধান গম্ভীর রচনা’ - এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন তা আমার বোধগম্য নয়। ভাষাশৈলীর দিক থেকে উভয় রচনাই দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। বরং ‘সহজ সাধুভাষা’ যাকে বলা যায় তার উদাহরণ আচার্যদেবের সাহায্যেই উদ্ধৃত করি।

সরল সংলাপধর্মী গদ্য ঃ

‘‘ একথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি ভাই, তুমি যথার্থই পাগল হয়েছ, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি ! কি লজ্জার কথা ; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি ; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন।’’

(ভ্রান্তিবিলাস, ১৮৬৯)

সমাজসংস্কারের পুরষ্কার স্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানারূপ কুরুচিপূর্ণ ভাষায় মন্তব্য পড়তে হয়েছে। এই অযৌক্তিক ভাষার উত্তরে তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ অথচ ‘রংদার’ গদ্যের অবতারণা করেন ঃ

‘‘ এতবুদ্ধি না ধরিলে, খুড় আমার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। হতভাগার বেটা, কি শুভক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই পৃথিবীতে অনেকের বুদ্ধি আছে, কিন্তু খুড়ার মত খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে খুড়র আপদবালাই লইয়া এই দন্ডে মরিয়া যাই ; খুড় আমার অজর অমর হইয়া চিরকাল থাকুন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময় খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক ; আঁখিতে যে গাছটা হয়েছে সেটা বিষম টোকো ও পোকাখেকো।’’

(আবার অতি অল্প হইল, ১৮৭৩)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় বৈচিত্র ছিল। কিন্তু বাংলা গদ্য ভাষার প্রমিত রূপ কি হবে তা ওই পাঠ্যের বৈচিত্রে একরকম চাপাই পড়ে গেল। অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহরাও চেষ্টা করলেন। তবু বঙ্কিমের আগে বাংলা গদ্যকে একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করতে কেউই পূর্ণ সক্ষম হলেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গে বঙ্কিমের ভাষা ছিল চলিত - আজ আমাদের সন্তানসন্ততি দুর্বোধ্য বাংলা জনসনীজকে যেরকম বঙ্কিমি বাংলা নাম দিয়েছে তা তাঁর ভাষারীতির প্রতি এক প্রকার অসম্মান প্রদর্শনই বটে। কারণ সংস্কৃতায়নের দুর্ভোগ থেকে সাহিত্যকে মুক্তি দান করেন বঙ্কিমই।

আমাদের সাধু গদ্য যেমন সংস্কৃতায়িত, অতি-সংস্কৃতায়িত, লঘু-সাধু, ঘরোয়া সাধু প্রভৃতি রূপ পায়, চলিত গদ্যের সূচনাতেও দুটি প্রধান বিভাজন দেখা যায়। ইতিমধ্যে চলিতের মূল রূপকার হয়ে দাঁড়ালেন দুজন - প্রথমত স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর মৃত্যুর পর প্রমথ চৌধুরী। অবশ্যই তাঁর আগে হুতোম প্যাঁচার নকশা-কে (১৮৬২) অস্বীকার করা যায় না। তবে বর্তমানে চলিত যে রূপে অভ্যস্থ তা হুতোমি ভাষা নয়। বরং একটু রসিক হওয়া যাক উদাহরণ দিয়ে ঃ

> ‘‘অমাবস্যার রাত্তির - অন্ধকার ঘুটঘুট্টি - গুড়গুড় করে মেঘ ডাকচে - থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্চে - গাছের পাতাটি নড়চে না - মাটী থেকে যেন আগুনের ভাপ বেরুচ্চে পথিকেরা এক একবার আকাশপানে চাচ্চেন আর হন হন করে চলচেন - কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ কচ্চে - দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জোগ করচে - গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেল। ..... গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল।’’

পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের ভাষার এক ঝলক দেখা যাক ঃ

> ‘‘ঐ হাঙ্গরের মাথা জল ছাড়িয়ে উঠল - টান্ ভাই টান্। ঐ যে - প্রায় আধখানা হাঙর জলের উপর। বাপ্ কি মুখ। ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে! .... এইবার, এইবার দড়ি ছাড় - ধুপ্ ! বাবা কি হাঙর। কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর পড়ল .....। ঐ কড়িকাঠ খানা দিয়ে ওর মাথায় মারো ওহে ফৌজি ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। ‘বটে তো’। রক্তমাখা গায়েকাপড়ে ফৌজী যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্‌দুম্ করে দিতে লাগল হাঙড়ের মাথায়, আর মেয়েরা ‘আহা কি নিষ্ঠুর ! মেরো না’ ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল অথচ দেখতেও ছাড়বে না’’

(পরিব্রাজক, ১৮৯৯)

উপরের দুটি ভাষার যে পার্থক্য তা শিক্ষাগত। হুতোমি ভাষা পাড়ার ওঁচাটে রকবাজের ভাষা ও স্বামীজির ভাষা প্রেসিডেন্সির ছাত্রের। মিল হ'ল, দুটিই পথের ভাষা - কেতাবের নয়। আজও উত্তর কলকাতার রাস্তায় কান পাতলে এই ভাষাই শুনব ছেলেছোকরাদের মুখে।

কিন্তু ভদ্রলোকের লেখার ভাষায় পথের ভাষার আমদানি কিঞ্চিত গাত্রকন্ডূয়ন সৃষ্টি করত তৎকালীন সমাজে। তাই কেতাবি বা মার্জিত চলিতের উৎপত্তির প্রয়োজন হল। জন্মদাতা 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী ঃ

> ''এদেশে ইংরেজ আসবার পূর্বেই এ পরিবারের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছিল, তার পর কোম্পানির আমলে এঁদের সর্বনাশ হয়। এঁদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পত্তিভাগ হওয়ার দরুন সে সকল শরিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ক্রমে তাঁদের বংশ লোপ পেতে আরম্ভ হ'ল।''
>
> (আহুতি)

সবুজপত্রের মাধ্যমে এই ভাষার প্রচার শুরু হয় ১৯১৪ সালে। তদাবধি আজ পর্যন্ত এই ভাষাই প্রমিত গদ্যভাষা। অবশ্য প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব ভঙ্গিমায় এর নানা বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। ইতিমধ্যে প্রমিত গদ্যশৈলীর অনুসন্ধান শেষ হয়েছে - এল তার বৈচিত্র নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার যুগ।

তাই চলিত গদ্যের আলোচনা এখানেই শেষ করা প্রাচীন পন্থীর কাজ। তাছাড়া যে সময়ে আমরা চলে এসেছি সেই সময় আরেকজনের আলোচনা না করলে এই যজ্ঞায়োজন শিবহীন থেকে যায়।

চলিতের দাবি মানতে রবীন্দ্রনাথেরও বেশি সময় লাগেনি। ১৯১৫ তেই শান্তিনিকেতন প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশিত হ'ল প্রমথ চৌধুরীর মার্জিত গদ্যে। তার পরবৎসর ঘরে-বাইরে ও বলাকা। তারপর থেকে মার্জিত চলিতেই প্রধানত রবীন্দ্রনাথ আবর্তিত হতে থাকেন।

তবে সাহিত্যের ধারায় দু'এক জন ব্যতিক্রম অবশ্যই থেকে যান - বিশেষ করে সাহিত্য যখন উন্নত হয় তখন তো আসেনই।

মার্জিত চলিতকে আরেক রূপ দিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। অবশ্য রূপ দিলেন কথাটা বলা ভুল হবে। কারণ রূপ দেওয়া তখনই হয় যখন এক প্রতিমার ধাঁচে আরেক প্রতিমা নির্মিত হয়। ১৯৩৭-এ যখন আকর্ণ-নয়না দুর্গাপ্রতিমার বদলে মানবীমুখী দুর্গা এলেন তখন সেটা রূপ দেওয়া হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য সুধীন্দ্রনাথের নিজের। যেকারণে সুধীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা যায় না - তিনি ভাষার বারোটা বাজিয়েছেন। সাধুকে অসাধারণ শৈল্পিক রূপে প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিম - একবারই - কপালকুন্ডলায়। এই সাধুই বোধহয় একমাত্র আধুনিকদের প্রিয়। কপালকুন্ডলা সবাই পড়েছেন। তাই এর উদাহরণ দিলাম না।

অপর্ণা সেন অভিযোগ করেছেন, আজকের বাঙালি সুধীন্দ্রনাথের ধ্রূপদী গদ্য বিস্মৃত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের আলোচনাকে বিদগ্ধজনের দেশ থেকে সাধারণ্যের আনন্দবাজারে নামতে দেখি না। তাই একটু পরিচয়দানের প্রয়োজন মনে করছিঃ

> ''বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরাজী ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ ; এবং আত্মনির্ভরের অভাব-বশতই আমি যে কালে গুরুজনদের ভর্ৎসনাভাজন, তখন ওই অহৈতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত। সুতরাং আরম্ভেই জানিয়ে রাখছি যে স্বগত-শব্দটা স্বাগতের মুদ্রাকরপ্রমাদ নয়, ওই কালিদাসী রঙ্গনির্দেশ শ্বেতদ্বীপ ঘুরে বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্থান পেয়েছে প্রাঙ্-মাইকেলী যুগ থেকে। সে-কালের বিপুলায়তন পাত্র-পাত্রীরা স্বাভাবিক জাড্যের দৌরাত্ম্যে যখন কর্মকান্ডে নিজেদের মনোভাব-প্রকাশে অপারগ হত, তখন তাদের অভিপ্রায় দর্শকের কাছে পৌঁছাত ওই বন্ধনীগত শব্দের দৌত্যে।''
>
> (সূচনা, স্বগত, ১৯৩৮)

বিংশ শতকের পঞ্চম দশাব্দীর শেষাবধি সুধীন্দ্রনাথের কলম মুখরিত ছিল। পাঠক ক্লান্ত হবেন, এই ভয়ে তাঁর ধ্রূপদীতর সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করালাম না। উৎসাহীগণ ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটস্থ দে'জ পাবলিশিং থেকে তাঁর গ্রন্থাবলি ন্যাজ্য মূল্যে ক্রয় করে পড়তে পারেন। নিজস্ব ভাষাশৈলীকে কোন পর্যায়ে উন্নীত করেছেন সুধীন্দ্রনাথ।

এই ভাষার সঙ্গে যোগ করা যায় কমলকুমারের ধ্রূপদী বাংলা। তবে ব্যতিক্রমের কিছু অন্য পর্যায়ও বর্তমান। কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলি প্রমুখ মুসলমান ধর্মাবলম্বী লেখকগণ বাংলা সাহিত্যের গড়নে আরবি-ফারসি শব্দ প্রবিষ্ট করান। যদিও বাংলা সাহিত্যে এই দুই ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ মুসলমানদের নিজস্ব কীর্তি নয়। ফারসি নবাবি বাংলার রাজভাষা থাকাকালীন হিন্দু কবিরাও এই সকল শব্দ অক্লেশে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজ আমলে যখন ফারসি শিক্ষা থেকে হিন্দুরা বিচ্যুত হন তখনই মুসলমানরা এককভাবে এই

সব শব্দকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস পান। তবুও বলব, অচলিত আরব্য শব্দে ভাষাকে ভারাক্রান্ত তাঁরা করেননি - যেমনটি আমাদের পূর্বজ সংস্কৃত পন্ডিতবর্গ করেছিলেন। সহজবোধ্য শব্দগুলিকে গ্রহণ করে ভাষাকে নতুন ধারা দিলেন তাঁরা। তবে সেই প্রচেষ্টা এই বঙ্গে সীমিত। আবুল বাশার তাঁর 'ফুলবউ' উপন্যাসের গড়নের দাবিতে এমন কিছু শব্দকে প্রয়োগ করেন - তবে সাধারণভাবে সীমিত লোকের রচনাতেই এই প্রভাব রয়ে যায়। তবে আধুনিক সংবাদপত্রের গুণে সেই ক্ষোভ দ্রুত মিটবে। সংবাদপত্রের ভাষা আপাতত আমাদের আলোচ্য নয় - তাই সেই আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি না।

প্রমথ চৌধুরী না হয় ১৯১৪-এ মার্জিত চলিতের প্রচলন করে গেলেন, তবু সেই ভাষা সর্বোব্যাপী হতে যথেষ্ট সময় নেয়। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের লেখায় লঘু-সাধুর প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য এই সাধু ক্রিয়াপদের মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য পদগুলিতে চলিত মর্ত্যে ভাগীরথীর ধারার মত ঢুকে পড়ে।

বন্দ্যোপাধ্যায়রা শেষ দিকে অবশ্যই চলিতের সাহায্য নেন। তবে তাঁদের উত্তরপুরুষরা সাধুর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখান নি। আজকের প্রজন্মে সাধু মহাপ্রস্থানের পথে। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় ও নবতিপর রবীন্দ্রকুমারের রচনা ছাড়া আর কোথাও তাঁর টিকির দেখা নেই। তাই সাধু নিয়ে বিস্তর আলোচনায় আর গেলাম না।

সাধুর আলোচনা শেষ করার সাথে সাথে জনসনীজ এর আলোচনাও শেষ করতে হয়। জনসনীজকে বাংলায় সংস্কৃতায়ন বলা যায় - সুধীন্দ্রনাথকে বাদ রাখি, কারণ তিনি ভাষার স্বাভাবিক ধারাকে ড. জনসনের মত প্রভাবিত করতে পারেননি। একই ভাবে কমলকুমারকেও বাদ রাখা যায়। কারণ তিনিও ব্যতিক্রম।

সাধারণভাবে জনসনীজের প্রতিক্রিয়ায় ৫ অগস্ট, ১৮৯০ তারিখে দ্য টাইম পত্রিকায় হাক্সলী'র মন্তব্য প্রকাশিত হয় ঃ

> "My impression has been that the Genius of the English language is widely different from that of Latin; and that the worst and the most debased kinds of English style are those which are Latinity."

দশ বছর পর স্বামীজিও আক্রমণ করলেন সংস্কৃতায়নকে ঃ

> ''চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুন্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো

> সমস্ত পান্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভুতকিমাকার উপস্থিত কর?''
>
> (ভাববার কথা, ১৯০০)

কিন্তু স্বামীজি সাহিত্যিক ছিলেন না, তাই তাঁর ইচ্ছা স্বার্থক হতে বেশ সময় লাগল - দুঃখের বিষয় স্বল্পায়ু সন্ন্যাসী তা দেখে যেতে পারলেন না।

সাধুর কথাটি ফুরল। সংস্কৃতায়ন মুড়ল। এবার আসি আমাদের যুগের কথায়।

সাধুর মত চলিতেও আমরা কয়েকটি পৃথক পৃথক ধারা লক্ষ করি। সেগুলিও লেখকভেদে, কখনও রচনার কোন বিশেষ আবেদনে জন্মেছে।

সুবোধ ঘোষের ভারত প্রেমকথা একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। এই গ্রন্থের বিষয় উৎসারিত হয়েছে পুরাণ থেকে। তাই ভাষাও কিঞ্চিৎ, ইংরেজিতে যাকে বলে 'আর্কেইক'। তবু এর গতি চলিত। সুধীন্দ্রনাথের গতিও চলিত ছিল - তবে এই গদ্যের ভাষা সুবোধ ঘোষের প্রমিত ভাষা নয়। রচনার অনুরোধে আমদানি করা। আরব্য রজনীর বঙ্গানুবাদে আমরা আরব্য শব্দের যেরুপ প্রয়োগ দেখি, অনেকটা সেই রকম।

> ''তারপর আর বেশি দিন নয়। নবাম্বুদের আড়ম্বড়ে আকাশ মেদুর হয়ে ওঠে যেদিন, সেদিন কৌতুকিনী সুশোভনা বর্ণায়িত দুকূলে কুসুমে আভরণে ও অঙ্গরাগে সজ্জিত হয়ে, সুলীল আবেগে প্রণয়ীর হাত ধ'রে বলে - উপবনভ্রমণে আমায় নিয়ে চল গুণাভিরাম। আজ মন চায়, দুই চরণের মঞ্জীর নৃত্যভঙ্গে শিঞ্জিত ক'রে তোমার শ্রবণপদবী রম্যনিনাদে নন্দিত করি।''
>
> (পরীক্ষিত ও সুশোভনা, ভারত প্রেমকথা, ১৩৬২)

কোন জাদুমন্ত্রে এই বই বেস্টসেলার হয়ে আছে তা আমার অজানা!

ভাষাসমূহের সাহিত্যে দুটি ভাগ থাকে, একটি জনপ্রিয় ধারা ও অপরটি ধ্রুপদী। বাংলার জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যিকরা সচরাচর ভাষা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। জনপ্রিয় ধারায় যেসব অপরাধ-সাহিত্য বা গোয়েন্দা সাহিত্য রচিত হত সেগুলি একটি সময় পর্যন্ত ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের - তা সাধারণকে আনন্দ হয়ত দিত, কিন্তু শার্লক হোমস বা আগাথা ক্রিস্টির কাছে তারা একান্তই ফুটপাতিয়া মানের। নেহাতই বটতলার উত্তরসূরি।

অথচ সাধারণ্যের ভাষারুচি গঠনে জনপ্রিয় সাহিত্যের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। শরৎচন্দ্র তার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রচলিত ধারা জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টি না করেও তিনি মানুষকে মার্জিত চলিতে অভ্যস্ত করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

প্রচলিত ধারার জনপ্রিয় সাহিত্য প্রথম ভদ্রজনোচিত রূপ পেল শরদিন্দুর হাতে। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে এই চতুর্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য রচনায় হাতিয়ার করলেন অপরাধ-সাহিত্য। প্রধানত বিদেশি প্রাণে দেশীয় শরীরে জন্ম নিলেন ব্যোমকেশ বক্সী। জনপ্রিয় সাহিত্য ধারা রূপই পেল না, এই ধারা একটি প্রমিত ভাষাশৈলীর সন্ধানও পেল।

> ''পাঁচ দিন পরে ব্যোমকেশ ফিরে এল, তার সঙ্গে একটি মানুষ। নিম্নশ্রেণীর পশ্চিমা যুবক। ব্যোমকেশ যুবককে নিয়ে সোজা থানায় উপস্থিত হলো, রাখালবাবুর সঙ্গে কথা বলল। তারপর যুবককে রাখালবাবুর জিম্মায় রেখে বাড়ি গেল। রাখালবাবুকে বলে গেল -'আজ বিকেল চারটের সময় বেণীমাধবের ড্রয়িংরুমে থিয়েটার বসবে, তুমি হবে তার স্টেজ ম্যানেজার।'''
>
> (বেণী সংহার, ১৯৬৮)

শরদিন্দুর এই সাবলীল সাহিত্যধর্মী ভাষাভঙ্গি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে সত্যজিত রায়ের লেখায়। বলা বাহুল্য, বাংলা জনপ্রিয় সাহিত্যধারার বেতাজ বাদশা। সত্যজিতের হাতে প্রথমত রূপ পায় অপরাধ-সাহিত্য।

> ''রাজেনবাবুকে রোজ বিকেলে ম্যাল-এ আসতে দেখি। মাথার সব চুল পাকা, গায়ের রং ফরসা, মুখের ভাব হাসিখুশি। পুরোনো নেপালী আর তিব্বতী জিনিস-টিনিসের যে দোকান আছে, সেটায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাইরে সে বেঞ্চিতে আধঘন্টার মত বসে সন্ধে হব-হব হলে জলাপাহাড়ে বাড়ি ফেরেন।''
>
> (ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি, ১৩৭৭)

পাশাপাশি কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যেও ঃ

> ''ফিল্ডিং মৌলিক সংখ্যা আওড়াতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখলাম পিরামিডের গায়ে অসংখ্য আলোকবিন্দুর আবির্ভাব হচ্ছে। ওগুলো আসলে ছিদ্র -স্পেসশিপের ভিতরে আলো জ্বলে উঠছে, আর সেই আলো দেখা যাচ্ছে, পিরামিডের গায়ে ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে।''
>
> (মহাকাশের দূত, শঙ্কু একাই ১০০, ১৩৯০)

গোয়েন্দা সাহিত্য ও কল্প বিজ্ঞানের ভাষাশৈলী পৃথক। তার থেকে পৃথক ধ্রূপদী সাহিত্যের ভাষা। কিন্তু ধ্রূপদী সাহিত্যের ভাষাও অনিবার্যভাবে প্রভাবিত হয় জনপ্রিয় সাহিত্যের ভাষার প্রভাবে। অনেক স্বনামধন্য লেখকই ভাষার ঋজুতার জন্য জনপ্রিয় সাহিত্যের ভক্ত। তাঁদের রচনাতেও আবশ্যিকভাবে ঢুকে পড়ে সেই ঋজু গদ্য।

> ''ওর বুকে, পেটে আর গলায় তিনটে গুলির দাগ ছিল। নীল গর্ত। শরীরে খুব কাছ থেকে ছোঁড়া গুলি। নীলচে চামড়া। কর্ডাইটের ঝলসানিতে পোড়া বাদামী রক্ত। গর্তের চারিদিকে কর্ডাইটের ঝলসানিতে ঝলসানো হেলো, চক্রাকার ফাটাফাটা চামড়া। গলায়, পেটে আর বুকে তিনটে গুলির দাগ।''
>
> (হাজার চুরাশির মা, ১৯৭৪)

জনপ্রিয় সাহিত্যের মত ঋজু, অথচ অনেক বেশি রিয়ালিস্টিক মহাশ্বেতা দেবীর এই গদ্য। এই ঋজুতাই প্রয়োজন ছিল সাহিত্যের। এতদিন সব ছিল, অভাব ছিল শুধু এটিরই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব গুহ এই গদ্যকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যান - নিজের নিজের মত করে। তাঁর আগে তাঁদের সমসাময়িক আরেকজনের কথা ভোলা অসম্ভব।

''ভাবখানা, আমি একটা তাজ প্রাণের দুঃসাহসী যুবক। এ ডেয়ার ডেভিল নাইস ইয়ংম্যান। একথা বলে আবার চোপরা, কারখানার ম্যানেজার। লেবার এ্যাডভাইসার মিত্তিরও বলে। স্‌সালা, এখন হাসি পায়, রাম খিস্তি করতে ইচ্ছে করে। তার ওপরে আবার যখন দেখি, ওদের বউয়েরাও ওরকম বলে। তোদের কত্তারা বলে, তার না হয় কারণ আছে। তোরা কেন বলিস? কুটকুটানি, না? সত্যি, দেখলে মেয়েলোক বলতে ইচ্ছে করে না, মাগী বলতে ইচ্ছে করে। আর মনে হয়, মাগীগুলো কস্মিনকালে গা ঘামে না, গায়ে পোকা। খাওয়া আছে, খাটুনি নেই। নরম নরম বিছানায় খালি থলথলিয়ে চিত্তির হয়ে পড়ে থাকা।''

(প্রজাপতি, ১৯৬৭)

বঙ্গ শিহরিত হয়েছিল। হুতোমি ভাষার আধুনিক সংস্করণ? এর বিচার গড়িয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে। সে যাই হোক, এও ঋজু গদ্য। মানুষের মুখের ভাষা। হয়ত একটা টাইপ। কিন্তু এই ভাষায় সাহিত্য কেন হবে না - সে প্রশ্নের সদুত্তর নেই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বহুমাত্রিক লেখক। কবিতা, কাব্যনাট্য, কথাসাহিত্য, অপরাধ-সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা শাখায় তাঁর অনায়াসচারণ। ভদ্রলোক স্টাইল বিষয়ে বিশেষ

সতর্ক। এমনিতেই প্রচন্ড সরল ও তীক্ষ্ণ তাঁর গদ্য। বাহুল্যবর্জিত। বহুমাত্রিক। অসমসাহসী। এবং একেক প্রশাখায় স্বকীয়। তাই একাধিক ভাষাশৈলীর সমাবেশ থাকলেও সমতা বর্তমান।

> ''তরুণী ঝুঁকে এসে তরুণের রোদ-বৃষ্টি-সমুদ্রে ছাপ আঁকা বুকে মুখ রাখলো। প্রথমে আলতো ভাবে চুমু খেল সারা বুকে। তারপর সে তরুণের ওষ্ঠে, চোখে, কপালে, পিঠে, হাতে পায়ে চুমু দিতে লাগল চোখ বুজে। যেন সে কিছু খুঁজছে।
>
> ''তরুণের উত্তেজিত পুরুষাঙ্গ যেন তার ট্রাউজার্স ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যুবতী একবার ঠোঁট ছোঁয়ালো সেখানেও।''
>
> (অমৃতের পুত্র-কন্যা, ১৯৮৩)

অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ সুনীলের বহুমাত্রিকতা এই ক্ষুদ্র উপন্যাসাংশ দিয়ে বোঝান যাবে না। শুধু ভাষাশৈলীর কমন ট্রেন্ডটাই ধরা পড়বে এতে।

সংস্কৃত ভদ্রোজনোচিত শব্দের সাথে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগে সুনীলের আপত্তি নেই। আসলে মার্জিত নামের আড়ালে আমরা মুখের ভাষাকে অস্বীকার করে থাকি, অনেক সময়। সবাই স্বামী বিবেকানন্দ নন, যে শুদ্ধ, চলতি সুন্দর ভাষায় অবিরত বাক্যালাপ করেন। এক ভদ্রলোক বাসে তাঁর সহযাত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন বেদান্ত সাহিত্য নিয়ে। বাসটা হঠাৎ সজোরে ব্রেক কশাতে ভদ্রলোক সিট থেকে ছিটকে পড়লেন। বেদান্তবাদ অদৃশ্য হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তাঁর, 'অ্যাই শালা শুয়োরের বাচ্চা। ঠিক করে বাসটা চালা না।' তবু সবসময় আমরা মার্জিত গদ্যের দোহাই দিয়ে চলব - এ নিতান্তই অগণতান্ত্রিক ব্যাপার।

যৌনতা ব্যাপারে অনেক খোলামেলা বুদ্ধদেব গুহও মার্জিত ভাষার ব্যাপারে বেশ সাবধানী পথিক। শীর্ষেন্দু অবশ্য কৌশলে এড়িয়ে গেছেন এই প্রশ্ন। কেন তা সবাই জানেন। যৌনতা, চলতি অশালীন ভাষা ইত্যাদি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি তুলে এনেছেন মাটির সব চরিত্র। সাধারণ্যের অসাধারণকে। মিস্টিকত্ত্বের মুর্ছনায় আপ্লুত করেছেন আমাদের।

এঁরা প্রবীন হয়েছেন এখন। অস্তাচলের যাত্রী। এরপর তাই আলোচনা করব আমাদের নিয়ে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক প্রজন্ম। এঁরা আমার বয়সের কাছাকাছি। তাই এঁদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমায় পন্ডিতের কাছে যেতে হবে না - বরং প্রাচীন পন্ডিতরা আমার কাছে আসবেন।

অত্যাধুনিকদের মধ্যে চারজন আমার সর্বাধিক প্রিয়। এঁদের নিয়েই আলোচনা করব। জয় গোস্বামী। মন্দাক্রান্তা সেন। তিলোত্তমা মজুমদার। শ্রীজাত। জয়ের বয়স অপেক্ষাকৃত বেশি। তিনি পঞ্চাশোর্ধ, তবু কিশোর। তাই আলোচনায় তাঁকে রাখছি। বাকিরা যুবক-যুবতী।

শ্রীজাত তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। তবু এঁদের রচনার ধার সুনীল-শীর্ষেন্দুকে ছাপিয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তাই এঁদের নিয়ে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন।

জয়ের গদ্য কবির গদ্য। তবে কবির গদ্য আমরা রবীন্দ্রনাথের হাতে যা দেখেছি, সেইরূপ নয়। রবীন্দ্র গদ্যের ভাষাভঙ্গিমা ছিল কবির, আত্মা ছিল গদ্যকারের। সুনীলের গদ্যকে কবির গদ্য বলা যায় না - কারণ কবি সুনীল ও কথা-সাহিত্যিক সুনীলের মধ্যে ফারাক বিস্তর। সে অর্থে জয়ের গদ্য একান্তই কবির গদ্য।

> ''সে, কিছুকাল হল চলে গেছে। সে মানে যৌনশক্তি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, আর তার দেখা মেলে না। এই যে সে চলে গেছে, এর জন্য কি আমার বিপুল কোন অসুবিধে হচ্ছে? দীর্ঘকাল ধরে যখন সে আমার সঙ্গে ছিল তখনকার তুলনায়েখন কি খুব কষ্টে দিন কাটছে আমার? তার বিরহে?.....
> ''বীজ দেব। বীজ।
> একদিন বললাম, নাও, নাও। ছন্দা বলল নেবই তো। বললাম সত্যি নেবে? সত্যি?
> ....
> ছন্দার সম্বিৎ ফেরে হঠাৎ, কি, একি, কিছু আনেননি?
> না।
> কোনও প্রোটেকশন আনেননি?''
>
> (প্রেতপুরুষ, ১৪১০)

একি গদ্য। না কবিতার ঝর্ণায় নগ্ন স্নানরত যুবকের মত ঋজু সুন্দর সাহিত্য নামের ফুলগন্ধ। ইংরেজি সাহিত্যের এই জিনিসেরই অভাব। স্পেন, ফরাসি বা জার্মান সাহিত্যে এই বন্য মাদকতা আছে। এতকাল সুনীল-সমরেশের সারল্যে শুধু গদ্য গদ্যের কথা বলত। এখন গদ্য বলল কবির কথা।

তিলোত্তমার অনেকগুলি লেখা আমার বিশেষ ভালো লেগেছে। তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে প্রহাণ, চাঁদের গায়ে চাঁদ ও রাজপাট (বর্তমানে দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশরত)।

> ''হ্যা হ্যা হ্যা ... তোকে স্কুল থেকে চিনি আমি, চিনি না? বল্ তুই আমার ন্যাংটো-পোঁদের বন্ধু না? মারবি? আমাকে মারবি? এই এই সুজয় আমি সরে যাব, মাইরি বিশ্বাস কর্, পার্টি ছেড়ে দেব, মায়ের দিব্যি, মা, আমার মা, মাগো, সুজয়

আমার মায়ের কথা ভাব্, আমি না থাকলে মা কি করবে? আঁক্ ওঁক্ খ খ খকৎ...''

(প্রহাণ, ১৪১০)

তিলোত্তমার এই গদ্যশৈলী রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে হয়ত পারতেন না। কিন্তু তিলোত্তমা জাত-ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের হস্তরেখা তাঁর চেয়ে ভালো এই প্রজন্মে আর কেউ বোঝেন না। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বমানে পৌঁছতে যাঁরা বদ্ধপরিকর, তিলোত্তমা তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অবশ্য বিশ্বমান ভাষাশৈলীর থেকে বেশি রচনার উপাদানের উপর নির্ভর করে। তা নিয়ে আপাতত আলোচনা করছি না।

মন্দাক্রান্তা ও শ্রীজাত আরও কেন্দ্রিক চরিত্র। 'পাবলিশ অর পেরিশ' মন্ত্রে সুনীলরা বিশ্বাস করেন। জয়-তিলোত্তমারা করেন না। মন্দাক্রান্তা-শ্রীজাত তো একদমই করেন না। সুতরাং সুনীলবাবুদের দেহাবসানের পর সাহিত্য আর পুজোসংখ্যার চাপে মরবে না - এই আশা রাখা যায়।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে আমি প্রধানত এই চারজনের কথাই বললাম, কারণ এঁরা আমার সবচেয়ে প্রিয়। প্রবীন প্রজন্মের অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্যপ্রয়াত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ; মধ্যপ্রজন্মের বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, আবুল বাশার, হর্ষ দত্ত, সমরেশ মজুমদার বা আমাদের প্রজন্মের সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিত তরফদার, নবকুমার বসু, পথিক গুহ, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সুবোধ সরকার প্রমুখরাও অনুরূপ আলোচনা দাবি করেন। আমার এই ক্ষুদ্রায়তন গদ্যপ্রচেষ্টায় সকলের গদ্যশৈলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় অপারগ হলাম, তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে কখনও বর্তমানদের নিয়ে, শুধু বর্তমানদের নিয়েই আলোচনা করব। কারণ তাঁরা স্বতন্ত্র। স্বকীয়। সাহসী।

জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩
বেহালা, কলকাতা
http://groups.yahoo.com/group/sahitya/